সৌরাষ্ট্র বিধানসভায় তাকে সাতটি আসন বরাদ্দ করা হয়। এইভাবে তার ভারতের অন্তর্গত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু পাকিস্তান এ নিয়ে তার আপত্তি জারি রাখে।[৪১]

কাশ্মীরের পরিস্থিতি কিন্তু ঢের বেশি ঘোরালো ছিল। দেশভাগের ইতিহাসের সঙ্গে তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুমিত গাঙ্গুলির যুক্তি অনুযায়ী, আসল সমস্যার মূল নিহিত ছিল 'দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রগঠনের পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শগুলির মধ্যে।'[৪২] ১৯৪৭ সালে মুসলিম-প্রধান রাজন্য-শাসিত রাজ্য কাশ্মীর ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের লাগোয়া ছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্কও জোরালো ছিল। কাজেই পাকিস্তান ন্যায্যতই ধরে নিয়েছিল যে ঐ রাজ্যের প্রতি তার স্বাভাবিক দাবি আছে। জিন্না আর মুসলিম লীগের কাছে কাশ্মীর-বিনা পাকিস্তান ছিল 'অসম্পূর্ণ'; ওদিকে নেহরু আর কংগ্রেসের কাছে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করাটা ছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয়।[৪৩] ১৯৪৬ সালের পর থেকে কাশ্মীর মহারাজা গুলাব সিংহ নামক একজন হিন্দু ডোগরা প্রধানের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। সে-রাজ্যের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় সামান্যতম কোনো অধিকার ছিল না। তাঁর বংশধর মহারাজা হরি সিংহও একটি ক্ষুদ্র উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ-ডোগরা গোষ্ঠীর সহায়তায় কাশ্মীর শাসন করতেন। এই উচ্চবর্গ সেখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতা তো বটেই, সেই সঙ্গে উর্বরা কৃষিজমির বেশির ভাগটাই নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু তিনি শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে পরিচালিত নিখিল জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখে পড়েন। তাঁরা কাশ্মীরি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের (*কাশ্মীরিয়াত*) হয়ে জোর সওয়াল করেন এবং মুসলিমদের অধিকার দাবি করেন।[৪৪] ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে আসা মুসলিম কনফারেন্স নামক গোষ্ঠীটি কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করলেও ন্যাশনাল কনফারেন্স, যার পিছনে শতকরা ৭৫ ভাগ স্থানীয় মুসলিমের সমর্থন ছিল, তারা নিজেরা কিন্তু অন্য কর্মধারা অনুসরণ করে। ১৯৪৬ সালের মে মাসে স্বাধীন ডোগরা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায় তাঁরা স্থানীয় হিন্দু পন্ডিতদের সঙ্গে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক জোট গড়ে তার ভিত্তিতে 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা করেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আরো কাছাকাছি চলে আসেন। আবদুল্লা, যাঁর সঙ্গে ১৯৩৮[৪৫] সাল থেকে নেহরুর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তাঁকে ডোগরা শাসনের বিরোধিতা করার জন্য

Scanned by CamScanner

জেলে পোরা হল। আর এইসব প্রতিস্পর্ধার মুখোমুখি হয়ে মহারাজা কোনো অধিগ্রহণ দলিল সই করতে রাজি হলেন না। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব থেকে প্রসারিত হয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি কাশ্মীরে ছড়িয়ে পড়ল। সেখানকার দুর্বল প্রশাসনের পক্ষে তা সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। কাজেই সহ-ধর্মীদের ওপর অত্যাচারের বদলা নেওয়ার অছিলায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতির লোকেরা পাকিস্তানি প্রশাসনের গোপন সাহায্য নিয়ে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল। মহারাজার ছোট্টো সেনাবাহিনী আর পৌর প্রশাসন সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা করে ধসে পড়ল এবং মহারাজা তখন ভারত সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। ভারত সরকার সাহায্য করতে রাজি হল এই শর্তে যে মহারাজাকে ভারতে যোগ দেওয়ার অধিগ্রহণ দলিলে সই করতে হবে। মহারাজা তাই করলেন। এর পর ভারতীয় সেনাবাহিনী অবিলম্বে শ্রীনগর বিমানবন্দরে অবতরণ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে এক দীর্ঘ-প্রলম্বিত সংঘর্ষের সূচনা ঘটে গেল। পাকিস্তানের মতে কাশ্মীর তার ন্যায্য অংশ, তাই সে সামরিক ব্যবস্থা নিল। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বেধে গেল ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে। কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাখ আর জম্মুর বেশির ভাগ জায়গাতেই ভারতীয় বাহিনী আপন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও পাকিস্তানি বাহিনী ঐ রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিজের দখলে রাখল, যাকে সে নাম দিল 'আজাদ কাশ্মীর'। এইভাবে ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর নাগাদ কাশ্মীর কার্যত দু-টুকরো হয়ে গেল। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে ভারত ঠিক করল যে বহুপাক্ষিক মীমাংসার জন্য বিষয়টাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে তোলা হবে।[৪৬]

প্রধানমন্ত্রী নেহরু যখন কাশ্মীর সমস্যাটাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে আইনগত দিক থেকে ভারতের ভিত্তিটা খুব শক্তপোক্ত, যেহেতু মহারাজা অধিগ্রহণ দলিলটি সই করেছেন এবং ঐ উপত্যকার অধিকাংশ মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে ন্যাশনাল কনফারেন্স একে সমর্থন করেছে। তিনি এই অভিযোগ জানালেন যে পাকিস্তান বেআইনি আক্রমণ চালিয়েছে, প্রথমে ঘুরপথে, তারপর সরাসরি। পাকিস্তান কিন্তু খোদ অধিগ্রহণ ব্যাপারটার আইনগ্রাহ্যতা নিয়েই আপত্তি তুলল। তার মতে চাপের মধ্যে জোর করে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।[৪৭] তবে তার চেয়েও বড়ো কথা, এই বিশ্বমঞ্চে এসে বিষয়টা ঠান্ডা লড়াইয়ের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল এবং ব্রিটেনের রণনৈতিক স্বার্থের অধীন হয়ে পড়ল।[৪৮] ফলে

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রসংঘ কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসতে পারল না এবং এমন কোনো স্পর্শগ্রাহ্য সমাধান দিতে পারল না যা উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ১৯৪৮-এর এপ্রিলে রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করবার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করল। ১৯৪৯ সাল নাগাদ সেই কমিশন জোড়াতালি দিয়ে একটি ঐকমত্যে উপনীত হল, যার দৌলতে ভারত আর পাকিস্তান উভয়েই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হল। গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানকে তার 'আক্রমণ-করা অবস্থান থেকে সরে যেতে' বলা হল আর ভারতকে বলা হল আইনশৃংখলা বজায় রাখবার জন্য যতটুকু দরকার সেইটুকু সৈন্য রেখে বাকি সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে; এর পর কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য একটি গণভোট নেওয়া হবে। কিন্তু সে-গণভোট কোনোদিনই আর নেওয়া হয়নি, কারণ ভারত দাবি করে যে, সমস্ত উপজাতীয় লোকজন ও পাকিস্তানি সৈন্য সরে গেলে পর তবেই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে; অপর দিকে পাকিস্তান বলল আগে গণভোট হোক, তারপর তার ফলাফল দেখে তবে সে সেনা প্রত্যাহার করবে। গাঙ্গুলির যুক্তি অনুযায়ী, ১৯৬০-এর দশক নাগাদ রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্ব, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।[৪৯] সমস্যাটা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের একটা দগদগে ক্ষত হিসেবে রয়ে গেল আর দু-দুটো যুদ্ধের জন্ম দিল—১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধ আর ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধ।

হায়দ্রাবাদে কিন্তু পরিস্থিতিটা ছিল ঠিক উলটো। সেটি ছিল মুসলিম শাসকের—নিজামের—অধীন এক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, যে-শাসনকে সমর্থন করত অত্যাচারী মুষ্টিমেয় মুসলিম শাসকবর্গ। রাজ্যটি চারপাশে ভূ-বেষ্টিত এবং ভারতের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও নিজাম ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা চাইলেন এবং ভারতের সঙ্গে কোনো অধিগ্রহণ চুক্তিতে সই করতে রাজি হলেন না। হায়দ্রাবাদের ভৌগোলিক অবস্থান (দক্ষিণ আর উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান পথ ঐ রাজ্য) এবং তার জনতাত্ত্বিক চিত্রের বিচারে ভারতের অনেকেরই মনে হয়েছিল, নিজামের স্বাধীনতার দাবি একেবারেই অবাস্তব এবং ভারতের নিরাপত্তার প্রতিকূল। কাজেই ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাবার পর নিজাম যে-স্বাধীনতার ফরমান জারি করলেন, ভারত সরকার তা অগ্রাহ্য করল। তার ওপর এই পর্বে হায়দ্রাবাদের ... জটিল হয়ে উঠল (অধ্যায় আট-এ এ ব্যাপারটি আগেই ... বিদঘুটে বাঁক নিল।

Scanned by CamScanner